গানের ভাষায় ভাষা আন্দোলন

অলোককুমার চক্রবর্তী

আবদুল গফফর চৌধুরীর সেই গানটি 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' শুনে যেমন মনে পড়ে যায় ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের কথা, যেমন অনিল সরকারের সেই কবিতাটি "একটি নদী উথাল পাথাল একটি নদী বরাক।/ সেই নদীটি মেঘনা তিতাস ব্রহ্মপুত্রের গান।/ এই নদীটি একাদশটি বলির উপাখ্যান।" পড়লে স্মৃতিতে ভেসে ওঠে ১৯৬১ -র বারাক উপত্যকার বাঙালিদের অসম সরকারের ভাষা-নীতির বিরুদ্ধে মাতৃভাষার সরকারি স্বীকৃতিলাভের (দ্বিতীয় রাষ্ট্র ভাষা) আন্দোলনের কথা, তেমনই অরুণচন্দ্র ঘোষের 'আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষারে / (ও ভাই) মারবি তোরা কে তারে' টুসু গানটি শুনলে আমাদের কারও কারও মনে পড়ে মানভূমের মাতৃভাষা বাংলার স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনের কথা (১৯৩৫-১৯৫৬), বাংলার প্রথম ভাষা আন্দোলন শুরু হ'লো ১৯৩৫ থেকে, যখন থেকে বিহারের কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দের বাংলা ভাষার প্রভাব খর্ব করার জন্যে উদ্যোগী হলেন। আর, ওপার বাংলার ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯৪৮-র ২১ মার্চ, জিন্না যখন ঢাকার জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করলেন। যদিও ওপার বাংলার ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিল মানভূমের ভাষা আন্দোলন থেকে চার বছর আগে। এছাড়া, ওপার বাংলার ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে রাজ্যভুক্তি বা ব্যবচ্ছেদের প্রশ্ন ছিল না। ছিল শুধু ভাষার প্রশ্ন এবং মাতৃভাষার স্বাধিকার রক্ষার প্রশ্ন। আত্মবিস্মৃত জাতি বলেই কি আমাদের স্মরণারতিতে স্থান পায়নি বাঙালির প্রথম ভাষা আন্দোলনের কথা? নাকি সীমান্ত বাংলার প্রান্তিক মানুষের আন্দোলন বলে বুর্জোয়া ইতিহাসকারেরা একে গুরুত্ব দেননি?

সে প্রসঙ্গ থাক। আমরা বরং অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আমি মানভূমের ভাষা আন্দোলনের কথা। পুরুলিয়া তখন জেলা ছিল না। মানভূম ছিল বিহারের ছোটনাগপুর ডিভিসনের অন্তর্গত। পুরুলিয়া ছিল মানভূম জেলার সদর মহাকুমা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি পেল ১৭৬৫ খ্রিঃ। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে ছিল অসংখ্য স্বাধীনচেতা জঙ্গল সর্দার। জঙ্গল - সর্দার বশে আনার জন্য কোম্পানী এনসাইন জন ফার্গুসনের নেতৃত্বে ১৭৬৭ খ্রিঃ যে অভিযান চালিয়েছিল, সাময়িক বিরতিসহ তা ৩৩ বছর চলেছিল। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক কর্তাদের রদবদল ঘটেছিল, রদবদল ঘটেছিল স্থানীয় সর্দারদের। জঙ্গল সর্দারদেরই অনেকেই কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

কোম্পানী আইন বলে (Regulation XVIII of 1805) তেইশটি পরগনা ও মহল নিয়ে গঠন করল জঙ্গল মহল জেলা (পাঁচেতসহ বীরভূম থেকে ১৫টি, বর্ধমান থেকে ৩টি এবং মেদিনীপুর থেকে ৫টি)। প্রশাসনিক ক্ষমতা দল জঙ্গল সর্দারের এবং রাজস্ব আদায়ের মূল দায়িত্ব ছিল পাঁচেতের রাজাকে। কিন্তু প্রায় পঁচিশ বছরের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন - শোষণের বিরুদ্ধে দাবানলের মতো কোল বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল সিংভূম-রাঁচি-পালামৌ ইত্যাদি অঞ্চলে। গঙ্গানারায়ণ বিদ্রোহ এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। মানভূম জেলার দক্ষিণাঞ্চলেও জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন। কোম্পানী সিদ্ধান্ত নিল (Regulation XVIII of 1833) জঙ্গলমহল ভেঙে অন্যান্য জেলার সঙ্গে যুক্ত করে আলাদা জেলা গঠনের। ১৮৩৩ খ্রিঃ গঠিত হ'লো মানভূম জেলা (Regulation, V o 1833)। সদর দপ্তর ছিল মানবাজার। ১৮৩৮ খ্রিঃ মানভূম জেলার সদর দপ্তর মানবাজার থেকে পুরুলিয়া শহরে স্থানান্তরিত হ'ল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫ খ্রিঃ) পরে ১৯১১ খিঃ অঞ্চল পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে বিহার, ছোটনাগপুর ও ওড়িশা নিয়ে গঠিত হ'লো নতুন প্রদেশ। মানভূম জেলা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বাঙালিরা যেমন এটা মেনে নিতে চায়নি, তেমনি বিহারের সচ্চিদানন্দ সিংহ, দীপনারায়ণ সিংহ, মুহম্মদ ফকরুদিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জানালেন (১৯২১)। তাঁরা যৌথ বিবৃতিতে বললেন, "The whole district of Manbhum and Pargana Dhalbhum District are Bengali Speaking and they should go to Bengal" সরকারি আশ্বাস সত্ত্বেও পরিবর্তন কিছু হয়নি।

জনসংখ্যার শতকরা ৮৭ ভাগ বাঙালির (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ আদমসুমার অনুযায়ী) মানভূম জেলার বিহারভুক্তির পরে বিহারের নেতৃবৃন্দের মানভূম জেলার হিন্দি ভাষা প্রচারে উঠেপড়ে লাগলেন (১৯৩৫ থেকে)। কারণ, ঐ বছর কংগ্রেস বিহার মন্ত্রিসভা গঠন করল। বাঙালিরা ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠল। রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠল 'মানভূম বিহারি সমিতি'। এর পাল্টা হিসাবে ব্যারিস্টার পি আর দাসের সভাপতিত্বে গড়ে উঠল 'মানভূম বাঙালি সমিতি'। ১৯৩৬ খ্রিঃ উড়িশা বিহার থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর বিহারি নেতৃবৃন্দ অনুভব করলেন, মানভূম আর বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না।

নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ভারত পেল স্বাধীনতা। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে গঠিত হল কংগ্রেস মন্ত্রিসভা। নানা প্রান্তে দাবি উঠল ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের। এ দাবী ছিল কংগ্রেসের ঘোষিত নীতিরই (১৯২০০এ নাগপুর অধিবেশন, ১৯২৮-এ লখনৌতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলন, ১৯৩৭-এ কলকাতা অধিবেশন, ১৯৩৮-এ কেরল প্রদেশ গঠনের কথা, ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনী ইস্তাহার) অনুরণন। বিহার সরকারের প্রত্যক্ষ উস্কানিতে মানভূমের সর্বত্র হিন্দি ভাষা প্রচারাভিযান শুরু হলো। মাতৃভূমের আদিবাসী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বিহার সরকার প্রায় ২৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করল। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হ'লো, মানভূমের সমস্ত স্কুলে বাংলার পরিবর্তে হিন্দি ভাষায় সাইনবোর্ড লিখতে হবে। স্কুল গুলিতে প্রার্থনাসংগীত বাংলার পরিবর্তে 'রামধন্' গাইতে হলে (স্কুল পরিদর্শকের সার্কুলার নং 700/5R, ১৮ মার্চ, ১৯৪৮)। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে পঠনপাঠনের ভাষা হলে হিন্দি (700/11g548)। সরকারি কাজকর্ম হল হিন্দি ভাষায়। পাশাপাশি মানভূম বাঙালি সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে তৈরি হচ্ছিল বাংলা স্কুল। দাবী উঠল বাংলাকে সরকারি ভাষা করার, মানভূমকে বঙ্গভূমি করার। সেদিন মানভূমের বিক্ষুব্ধ বাঙালিরা বিহারিদের হুমকীর কাছে "মানভূম বঙ্গাল মেঁ নহী জায়েঙ্গে, জানে পর খুন কে নদী বহা দেঙ্গে" মাথা নত করেননি।

এদিকে মানভূমের জেলা কংগ্রেস পড়েছে উভয় সংকটে– ‘শ্যাম রাখ না কুল রাখি’ অবস্থা। একদিকে ভাষা আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন, অন্যদিকে রাজ্য তথা কেন্দ্রিয় কংগ্রেসের সরাসরি রোধিতা করাও অসম্ভব। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের সদ্য মৃত্যুর পর মানভূম কংগ্রেসের জেলা সভাপতি হলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ, আর সম্পাদক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। ১৯৪৭ -এর ২৭ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ঘোষণা করলেন– “First thing must come first and the first thing is the security and stablity of India.” প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় গোটা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। কংগ্রেসের মধ্যেও দেখা দিল বিক্ষোভ। কনস্টিটুয়েন্ট এসেমব্লির ড্রাফটিং কমিটির সুপারিশক্রমে যে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন অনুচিত, ভারতের নিরাপত্তা ও স্থায়ীত্বকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। দেশজুড়ে অসন্তোষ ধূমায়িত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী কমিশনের ভি.পি.কমিটি (জহরলাল, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পট্টভি সীতারামাইয়া প্রমুখ) নামে পরিচিত।

জেলা কংগ্রেসের মুখপত্র ‘মুক্তি’ পত্রিকায় (৮ মার্চ, ১৯৪৮) জোর করে হিন্দি ভাষা চাপানো, বাঙালি বিক্ষোভ, মানভূম জেলার বঙ্গভূমির যৌক্তিকতা নিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হলে, সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রামে কংগ্রেস জেলা কমিটির অধিবেশন ডাকা হ'লো (৩০ এপ্রিল, ১৯৪৮)। ঐ সম্মেলনে মানভূমের ভবিষ্যৎ নিয়ে মতান্তর ঘটলে, পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে আবার অধিবেশন ডাকা হ'লো (৩০ ও ৩১ মে ১৯৮৪)। সভাপতিরূপে অতুলচন্দ্র ঘোষ জিতান সম্মেলন মানভূমের বঙ্গভূমিকতার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাকে ভোটে দেওয়া হ'লো। প্রস্তাবের পক্ষে ৪৩ এবং বিপক্ষে ৫৫টি ভোট পড়লে, পরাজয়ের নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে সভাপতি ও সম্পাদক পদত্যাগ করলেন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষরিত ‘মানভূম বর্তমান পরিস্থিতি ও জেলা কংগ্রেসের দায়িত্ব’ শীর্ষক ইস্তাহারে মানভূমবাসীর উদ্দেশে অতুলচন্দ্র যা বললেন, তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছি : ‘জেলা কংগ্রেস কমিটিতে ইহাই আমার প্রস্তাব ছিল। ইহাতে প্রদেশবন্টন ও ভাষা বিষয়ে উত্থাপিত ভ্রান্তিসমূহে আমাদের সকলের কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে। কমিটির ভিতর দিয়া ইহা প্রকাশের সুযোগ হইল না বলিয়া আমি ও আমার সহকর্মীগণ আমাদের নিজেদের দায়িত্বে ইহা জনগণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। যাহা সত্য বলিয়া জানি, প্রস্তাবে তাহাই লিখিত হইয়াছে এবং তাহাই জনগণের বিচারের জন্য আমরা রাখিতেছি। আমরা বিশ্বাস করি সত্যের নির্দেশ, কংগ্রেস নীতি ও আদর্শ পালন করিয়া চলিতে হইলে আমাদিগকে এই প্রস্তাবের মর্মেই চলিতে হইবে। দেশবাসী মনোযোগ সহকারে সমগ্র বিষয়টি পড়িয়া দেখিবেন, এবং সত্য বুঝিলে এইভাবে চলিবেন– ইহাই আমার প্রার্থনা।” অতুলচন্দ্র ঘোষ এবং বিভূতিভূষণ হলেও, ভাষা আন্দোলন ও মানভূমের বঙ্গ ভুক্তির সবচেয়ে প্রচারক হয়ে দাঁড়াল লোকসেবক সংঘ।

লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বে শুরু হ'লো মানভূমের বঙ্গভুক্তির দাবীতে ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলনে ‘মানভূম গান্ধী’ নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, ‘মানভূম কেশরী’ অতুলচন্দ্র ঘোষ এবং তার স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ও পুত্র অরুণচন্দ্র ঘোষ, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁরা আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিলেন টুসু গান– মানভূমের জনপ্রিয় লোকসংগীত। অরুণচন্দ্র ঘোষ, সাংসদ ভজহরি মাহাতো, জগবন্ধু ভট্টাচার্য প্রমুখ টুসু গান বেঁধে জনচেতনাকে জাগ্রত করলেন। নানা অঞ্চলে তৈরি হ'লো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যাঁরা দলবেঁধে টুসু ও ঝুমুর গান গেয়ে ভাষা আন্দোলনের দাবীকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বে অতুলচন্দ্র ঘোষ শুরু করলেন– টুসু সত্যাগ্রহ (১৯৪৮)। অরুণচন্দ্র ঘোষ ষোলো পৃষ্ঠার একটি টুসু গানের সংকলন প্রকাশ করলেন– ‘টুসুর গানে মানভূম’। বিহারের হিন্দিভাষী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের ঘৃণ্যা রাজনীতির বিরুদ্ধে অরুণচন্দ্রের লেখা এই টুসু গানটি তৎকালীন মানভূমবাসীর মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলো–

আমার ভাষা প্রাণের ভাষারে
(এ ভাই) মারবি তোরা কে তারে।।
এই ভাষাতেই কাজ চলছে
  সাত পুরুষের আমলে
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে
  মুখ ফুটেছে মা বলে।।
এই ভাষাতেই পরচা রেকর্ড
  এই ভাষাতেই চেক-কাটা
এই ভাষাতেই দলিল নথি
  সাত পুরুষের হক পাটা।। ইত্যাদি

কিংবা বিহার সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভজহরি মাহাতোর যে প্রতিবাদী টুসু গানটি–

শুন বিহারি ভাই
  তোরা রাখতে লারবি ভাঙ্ দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
  বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।
ভাইকে ভুল করলি বড়
  বাংলা বিহার বুদ্ধিটাই। ইত্যাদি

অথবা, বিহারী কংগ্রেসিদের বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা এবং বাঙালি ক্ষোভ ও অভিমান ফুটে উঠেছে জগবন্ধুর সেই গানে

প্রাণে আর সহে না

হিন্দি কংগ্রেসীদের ছলনা।
ইংরেজ আমলে যারা গো
করতো মোসাবিয়ানা
এখন তার হিন্দি-কংগ্রেসি
মানভুমে দেয় যাতনা
বিহার সরকারের জোর করে হিন্দি চাপানোর বিরুদ্ধে মানভূমবাসীর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে মধুসূদন মাহাতোর সেই জনপ্রিয় গানে—
মন মানে না হিন্দিরে সইতে
ভাষা মোদের হরে নিল হিন্দিতে।
মাতৃভাষা হরে যদি
আর কী মোদের থাকে রে?
(তরই) মধু বলে মাতৃভাষায়
ধ্বজা হবে বহিতে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেমন বিভিন্ন কবির লেখা স্বদেশী গানগুলি মানুষের মধ্যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল, তেমনই মানভূমের বঙ্গভুক্তির জন্য ভাষা আন্দোলনে এমনই বহু টুসু ও ঝুমুর গান মানভূমবাসীকে উদ্বেলিত করল।

মানভূম জেলার ভাষা আন্দোলনের পক্ষে 'মর্মবাণী', 'কল্যাণবার্তা', 'হরিজন কল্যাণ-সংবাদ', 'পল্লীসেবক', 'তপোবন', 'অগ্রগামী', 'মানভূম' ইত্যাদি বাংলা পত্রিকা এবং বিপক্ষে 'নিরালা', 'প্রগতি' 'নির্মাণ', 'প্রজাতন্ত্র', 'জনসেবক', 'সমবেত' ইত্যাদি হিন্দি পত্রিকা এবং বাংলা -হিন্দি মিশ্রিত 'জনজাগরণ', 'জনবিদ্রোহ' ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল। অন্যাদিকে বিহার সরকার টুসু - সত্যাগ্রহ দমনের জন্য ১৯৫৪-র ফেব্রুয়ারি - মার্চে নিরাপত্তা আইনে পাঁচটি টুসু দলের ৪০ জন সত্যাগ্রহী, লোকসেবক সংঘের অতুলচন্দ্র ঘোষ, তাঁর স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, লোকসভার সদস্য ভজহরি মাহাতো, সাংবাদিক অশোক চৌধুরী প্রমুখ অনেককে গ্রেপ্তার করল। সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবিবুল্লার নেতৃত্বে পুলিশি মানবাজারের সত্যাগ্রহীর বাড়ি ভাঙচুর করলো, মহিলাদের শ্লীলতাহানি করলো (২রা মার্চ, ১৯৫৪)। বান্দোয়নের মধুপুর গ্রামের লোকসেবক সংঘের অফিস তছনছ করল পুলিশ, বাজেয়াপ্ত করল 'টুসু গানে মানভূমি' পুস্তিকাটির প্রায় ২৩০০ কপি। বিহারের কংগ্রেস সরকার অসুস্থ ৭৩ বছরের অতুলচন্দ্র ঘোষকে নয় মাসের কারাদন্ড দিয়ে হাজারিবাগ জেলা পাঠাল। দেড় মাসের মাথায় শ্রীঘোষ মুক্তি পেলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ও ভবানী মাহাতোকে পুরুলিয়া জেলা থেকে হাজারিবাগ জেলে পাঠাল। পুরুলিয়া জেলে অসহ্য নির্যাতনের পর বিধায়ক সমরেন্দ্র ওঝা, শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একশ' জন টুসু সত্যাগ্রহীকে হাজারিবাগ জেলে পাঠানো হ'লো। পুলিশি নির্যাতন যেমন চললো তেমনই মানভূমের বাঙালিকে প্রলোভনস্বরূপ হিন্দিভাষা প্রচার ও প্রসারের নামে ত্রিশ লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করল বিহার সরকার। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন সংগঠন নানা প্রচার এর মাধ্যমে বিহারের কংগ্রেস সরকারের ষড়যন্ত্রের কথা জনমানসে তুলে ধরল। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাবা এন. সি. চ্যাটার্জি লোকসভায় পুরুলিয়ার টুসু-সত্যাগ্রাহীদের ওপর নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করেন এবং অত্যাচার বন্ধের দাবী করেন (২৯ মার্চ, ১৯৫৪)। লোকসেবক সংঘের হয়ে মানুভূম - ধলভূম নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জয়ী চৈতন-মাঝি লোকসভায় (২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৫)। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন।

ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের জন্য যখন গোটা দেশ তোলপাড়, তখন কেন্দ্রিয় সরকার বাধ্য হয়ে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করে (১৯৫৩) জনগণ ও বিভিন্ন সংস্থার তরফ থেকে প্রস্তাব চাইল। ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী তদানীন্তন ভারতের কমুউনিস্ট পার্টি ১৯৫৪-র জুন মাসে কমিশনের কাছে স্মারকলিপি দিল— 'ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের জন্য আমাদের জনগণের সংগ্রাম ছিল আমাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের অংশ। কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে, ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন, দেশের গণতান্ত্রিক পুনগঠনের জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পূর্ব শর্ত, যা বাদ দিয়ে দেশ কখনোই সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির রাজপথে হাঁটতে পারে না।... ভারতের ঐক্যের ভিত্তিভূমি তৈরি করার জন্য এটি আবশ্যক...ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করার ক্রমবর্ধমান দাবি দেশের গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানেরই একটি অঙ্গ।" পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব ছিল, বিহার-উড়িশার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সীমানা পুনর্বিন্যাস করে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গকে অটুট রাখা।

কমিশন ধানবাদকে বিহারে রাখার সুপারিশ করল (Report of SRC, Para 659)। আর চাস থানা ছাড়া সমগ্র পুরুলিয়া মহাকুমা পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্তির কথা বলল (SRC, Para 666)। ধলভূম পরগনার কিছু এলাকা পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত করতে অস্বীকার করলে (SRC, Para 667), মানভূম আন্দোলন মানভূমের ভৌগোলিক এলাকা অতিক্রম করে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল। পালন (২১ জানুয়ারি, ১৯৫৬)। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ যৌথ বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার নিয়ে 'পূর্বপ্রদেশ' গঠনের প্রস্তাব দিলে (২৩ জানুয়ারি, ১৯৫৬), সমগ্র বাংলা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিমলচন্দ্র সিংহ প্রমুখ প্রাক্তণ কংগেসি নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ জানালেন। কংগ্রেসের বহু সদস্যও প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটি 'বঙ্গ-বিহার একীকরণ বিভেদের ষড়যন্ত্র' শীর্ষক বিবৃতিকে প্রতিবাদ জানালো"...এই কৃত্রিম জবরদস্তিমূলক মিলন অনিবার্যভাবে যে সংঘাত সৃষ্টি করিবে তাহাতে বাঙালি ও বিহারী নিজ নিজ সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবন - প্রণালীর যে সম্পদ ইতিমধ্যে সৃষ্টি করিয়াছে তাহাও পর্যন্ত একান্তভাবে বিপন্ন হইবে।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের প্রশ্নে এবং বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির রায়-সিংহ প্রস্তাব বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর.এস.পি. ইত্যাদি বামপন্থী দলগুলি কোলকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় প্রাচারাভিযানের মাধ্যমে বিপুল জনসমর্থন গড়ে তুলল। লোকসভা, বিধানসভা, বিধান পরিষদে প্রতিবাদের ঝড় তুলল। বামপন্থী এই আন্দোলনে সামিল হ'লো

কৃষক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, ছাত্র-শিক্ষক-সংগঠন, বিজ্ঞানকর্মী সংগঠন, নাট্য ও চলচ্চিত্র শিল্পী। তৈরি হ'লো পশ্চিমবঙ্গ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি। সম্পাদক নির্বাচিত হলেন মোহিতকুমার মৈত্র। এই কমিটির নেতৃত্বে চলল বড় বড় প্রচারসভা, জোলায় জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন ('স্বাধীনতা' পত্রিকা, জানু-এপ্রিল, ১৯৫৬ সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য)। কলকাতা সিনেট হলে যে সারা বাংলা ঐতিহাসিক সম্মেলন হ'লো তাতে যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন মেঘনাদ সাহা, বাংলার প্রক্তান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, কাজী আবদুল ওদুদ্দ, গোপাল হালদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুঘ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। পুরুলিয়ার জামতাড়া গ্রামে লোকসেবক সংঘের উদ্যোগে প্রায় দশ লক্ষ লোকের এক প্রতিবাদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'লো।

জামতাড়া সম্মেলনে ঐতিহাসিক বঙ্গ সত্যাগ্রহ অর্থাৎ কলকাতা অভিযানের প্রস্তাব কৃহীত হ'লো। ২০ এপ্রিল, শুক্রুবার, ১৯৫৬। পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার পাক্‌বিড়র‍্যা গ্রাম থেকে শুরু হ'লো ঐতিহাসিক পদযাত্রা। যাত্রাপথের মানচিত্র তৈরি করে রেখেছিলেন লোকসেবক সংঘের সচিব বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। টুসু সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য অরুণচন্দ্র ঘোষ প্রকাশ করলেন 'টুসুর গানে সত্যাগ্রহ বুলেটিন'। হলেন। সঙ্গে ছিলেন সাংসদ ভজহরি মাহাতো ও চৈতন মাঝি, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, অরুণচন্দ্র ঘোষ, বাসন্তী রায় এবং লক্ষ্মী। দামিনী, পুর্ণিমা, সারদা, ভামিনী, যশোদা, চাঁপা, শান্ত প্রমুখ এবং বেশকিছু আদিবাসী রমণী। সঙ্গে চলল টুসুর গানের বেশ কয়েকটি দল। সত্যাগ্রহীরা পাক্‌বিড়র‍্যার থেকে বাঁকুড়া শহর-বেলিয়াতোড় - সোনামুখী-পাত্রসায়র এবং বর্ধমানের খন্ডকোষ-বর্ধমান শহর এবং হুগলীর পান্ডুয়া-মগরা চুচূড়া-চন্দননগর এবং হাওড়ার স্টেশন থেকে কলকাতায় পৌঁছালো ১৯৫৬-র মে রবিবার, বিকেল লেলায়। কলকাতার অসংখ্য মানুষ তাদের ফুল মালা দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন। তাঁদের মদ্যে ছিলেন হেমন্তকুমার বসু, জ্যোতি বসু, মোহিতকুমার মৈত্র, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সেদিন বিকেলের কলকাতা ময়দানের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। এদিকে ধলভূমের বঙ্গভূক্তির দাবী নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী ও কিশোরীমোহন উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'মুক্ত পরিষদ'-র ১৭৫ জন পদযাত্রী কলকাতায় পৌঁছল ১৯৫৬-র ৫ মে। তারা হাজরা পার্কে যে জনসভা করেন, তাতে সভাপতিত্ব করেন নাট্যাচার্য শিশির ভাঁদুড়ি। সভায় ভাষণ দেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সাতকড়ি রায় প্রমুখ বিখ্যাতজন। ধলভূমের সত্যাগ্রহীরা মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালে, পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করল। ৭ মে লোকসেবক সংঘের সত্যাগ্রহীরা ডালহৌসী স্কোয়ারে ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে নেতাজি সুভাষ রোডে গ্রেপ্তার হলেন। উদ্দেশ্য ছিল রাইটার্স বিল্ডিং অপরোধ। প্রায় ১০০০ জন গ্রেপ্তার বর করলেন (একটি বাহিনীতে ১০০ করে মোট দশটি বাহিনীতে হাজার জন। মহিলা বাহিনীর নেত্রী ছিলেন লাবণ্যপ্রভা ঘোষ এবং নিবারণ দাসগুপ্তের কন্যা বাসন্তী রায়)। কলকাতার প্রেসিজেন্সি, আলিপুর সেন্ট্রাল, আলিপুর স্পেশাল জেলে বন্দীদের রাখা হ'লো। পশ্চিমবাংলার নানাস্থানে ৩৩০০ স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করলেন। পরে অবশ্য বন্দীদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হ'লো। ইতিমধ্যে আন্দোলনে বিভ্রান্ত মুখ্যমন্ত্রী বিদান রায় দিল্লী গিয়ে নেহরু প্রমুখের সঙ্গে পরামর্শ করে কলকাতায় ফিরলেন (৩রা মে, ১৯৫৬) এবং গণদাবী মেনে পরদিন বিধানসভায় বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির (পূর্ব-প্রদেশ) প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন। ঐ বছর ১৭ই আগস্ট লোকসভার সর্বসম্মতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গ-বিহার ভূমি হস্তান্তর বিল পাশ হ'লো সীমানা নির্ধারণের জন্য গঠিত যুক্ত সিলেক্ট কমিটির সুপারিশক্রমে।

১লা নভেম্বর পুরুলিয়া সদরের ষোলোটি থানা এবং পুর্ণিযার কিছু অংশ নিয়ে গঠতি হ'লো পুরুলিযা জেলা। আনন্দধারা বয়ে গেল পুরুলিয়া তথা পশ্চিমবাংলায়। মানভূমবাসীর দীর্ঘদিনের বঙ্গ ভুক্তি তথা ভারত আন্দোলনের লড়াই সফল হ'লো। আর এক্ষেত্রে লোকসেবক সংঘ ও বামপন্থী দলগুলির ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মুলত টুসুর মতো লোকগানকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে আন্দোলন পরিচালনা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বামপন্থী অধ্যাপক সুধীর করণ এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'ধলভূম-মানভূমের ভাষা ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধটি লেখার জন্য তাঁকে দুমকা এস. পি. কলেজের অধ্যাপনা থেকে অপসারণ করা হোল। ধলভূমের মুক্তিমোর্চার নেতৃত্বে গিয়ে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে একসঙ্গে পুরুলিয়ার বঙ্গভূমি ও মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। হয়তো ভাবীকালে তন্বিষ্ঠ গবেষক অনুসন্ধান করে বের করবেন। বাঙালির প্রথম ভাষা আন্দোলনের নতুন নতুন তথ্য, আর স্মরণ করবেন নরেন্দ্রনাথ দেব ও তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবীর সেই অবিস্মরণীয় কবিতাটি–

বহু মানে আজ মানভূমে মোর
    এই শুভদিনে নিলাম বরি,
ধন্য হলেন জননী আবার
    হারানো তনয় বক্ষে ধড়ি।
জয় গৌরবে এসেছে ফিরিয়া
    সন্তান তার আপন গেহে,
ছিন্ন অঙ্গ দেশমাতৃকা
    দেখা দিল পুনঃ পুর্ণ দেহে।
জানি, জানি যাহা রয়ে গেল বাকি
    মাতৃভাষার ঐক্যতীরে
তোমাদের দৃঢ় সাধনার বলে
    একদা তাহাও আসিবে ফিরে।

—'মুক্তি', ১৭ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা।

উৎস সন্ধান:
১। তরুণদেব ভট্টাচার্য - পুরুলিয়া।
২। গৌতম দে- মানভূম থেকে পুরুলিয়া।
৩। দেবপ্রসাদ জানা - সম্পাদক: অহল্যাভূমি পুরুলিয়া, ২য় পর্ব, দ্রষ্টব্য ডঃ শান্তি সিংহ-এর প্রবন্ধ।
৪। পশ্চিমবঙ্গ পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা।
৫। ডঃ শান্তি সিংহ - টুসু গ্রন্থ।
৬। ডঃ সুধীরকুমার - সম্মাননা গ্রন্থ
৭। বদরুদ্দীন ওমর - পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি।
৮ 'মুতি' পত্রিকার প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি।
৯। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি।
১০। Report of State Reorganisation Commission. 1955
১১। Report of Linguistic Provinces Commission, 1948
১২। Circular of District Inspector of Schools, Manbhum, 1948
১৩। West Bengal District Gazetteers, Purulia 1985.
১৪। Speech of Jawaharlal Nehru, Prim minister of India, 27 Nov. 1947.
১৫। Memorandum Before States Reorganisation Commission by Govi. of West Bengal.
১৬। Supplementary to the Memorandum Before States Reoganisation Commis sin by Govt. of West Bengal.
১৭। Subhas Chandra Mukhopadhyay - Glimpses of The history of Manbhum.